সংবাদ সম্মেলন

“অবিলম্বে বন্ধ করুন স্পেশাল ফোর্সের এই হত্যাযজ্ঞ” শিরোনামের সংবাদ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৩ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে, সকাল ১১ টায়, জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে। সংবাদ সম্মেলনের আয়োজক সংগঠনগুলো হচ্ছে– আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব-াস্ট), নিজেরা করি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, জাতীয় আইনজীবী পরিষদ, নারীপক্ষ এবং কর্মজীবী নারী। এই ৭টি সংগঠনের পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন *ডঃ হামিদা হোসেন* প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), *সুলতানা কামাল* নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), *সাদেকা আহমেদ* সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, *ফরিদা ইয়াসমিন* বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, *রেজানুর রহমান* নিজেরা করি, *ফেরদৌসী আক্তার* নারীপক্ষ, *এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম* জাতীয় আইনজীবী পরিষদ, *সোফিয়া আহমেদ* কর্মজীবী নারী।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আসক-এর নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল।

অবিলম্বে বন্ধ করুন স্পেশাল ফোর্সের এই হত্যাযজ্ঞ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা

আজ আমরা এমন এক বিশৃঙ্খল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে সামনে নিয়ে এই সাংবাদিক সম্মেলনে সমবেত হয়েছি, যেখানে আইন রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্তদের হাতেই আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে নিদারুণ মাত্রায়। গত ২৮ জুন ২০০৪ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩২ ব্যক্তি নিহত হয়েছে র‌্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন বা র‌্যাবের হাতে (এই পরিসংখ্যান ১৩ অক্টোবর ২০০৪ পর্যন্ত)। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মারা গেছে তাদের হেফাজতে। এছাড়া যারা র‌্যাব হেফাজতে ছিল না কিন্তু র‌্যাব পরিচালিত অভিযানে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মৃত্যুর ধরন নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। সেই সাথে রয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কোবরা, অস্কার, চিতা ইত্যাদি নামধারী বেশকিছু স্পেশাল ফোর্সের কাছাকাছি ধরনের তৎপরতা। সব মিলিয়ে সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে যে চরম ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছে তাতে শুধু মানবাধিকার সংগঠনগুলো নয়, বরং সারা জাতিই আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

উল্লেখ্য, স্পেশাল ফোর্স র‌্যাপিড একশন টিম বা র‌্যাটের তৎপরতা দৃশ্যত ব্যর্থ হলে সরকার গত বছরের ১২ জুলাই র‌্যাবের জন্ম দেয়। এজন্য যে আইনটিকে সংশোধন করা হয়েছে সেটি হচ্ছে– The Armed Police Battalions Ordinance 1979। এই সংশোধনী অনুযায়ী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য সাধারণ দায়িত্বের সাথে যে দু'টি বিশেষ দায়িত্ব র‌্যাবকে পালন করতে হবে সেগুলো হচ্ছে:

- অপরাধ ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালন এবং
- সরকারের নির্দেশে কোনো অপরাধের তদন্ত পরিচালন।

লক্ষণীয় যে, অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে র‌্যাবকে সাধারণ ক্ষমতা দেয়া হয়নি বরং এক্ষেত্রে সরকার দ্বারা নির্ধারিত অপরাধের ক্ষেত্রেই র‌্যাব তদন্ত করতে পারবে। এ বিধানটি র‌্যাবকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছে। তবে সংশোধনীতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কোনো অপরাধ তদন্তে র‌্যাব ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করবে। ফৌজদারি কার্যবিধিতে তদন্ত পরিচালনার যে নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা আছে তা অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের জন্য পর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা প্রদান করে। সেই সাথে সংবিধানে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেসব রক্ষাকবচ দেয়া হয়েছে সেগুলো যেকোনো অবস্থায়, যে কারও জন্যই প্রযোজ্য।

কিন্তু আইনের বিধিনিষেধের সাথে র‌্যাবের বাস্তব কার্যকলাপের রয়েছে বিস্তর ফারাক। সংবিধান, ফৌজদারি কার্যবিধি বা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী অধ্যাদেশ– কোনো আইনের বিধানই র‌্যাব মানছে না, প্রতিনিয়তই লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। র‌্যাব তার এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিংয়ের পোশাকী নাম দিয়েছে 'ক্রসফায়ারে মৃত্যু'। কিন্তু বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও হেফাজতে থাকা আসামিকে সাথে নিয়ে র‌্যাবের অস্ত্র উদ্ধারে যাওয়া, সেখানেই আসামির সহযোগীদের অস্ত্র বাগিয়ে ওত পেতে বসে থাকা এবং তাদের সাথে গোলাগুলিতে একমাত্র হেফাজতে থাকা আসামিটির গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া– ঘটনাচক্রের এই ব্যতিক্রমহীন পরম্পরার মর্মার্থ বুঝতে সাধারণ জনগণের খুব একটা সমস্যা হয় না, উদঘাটিত হয়ে পড়ে 'ক্রসফায়ার' রহস্য। লক্ষণীয় যে, প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই হেফাজতি আসামি আহত হয় না, একেবারেই মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ 'ক্রসফায়ার'-এর প্রকৃত ঘটনা বয়ানের জন্য পৃথিবীতে আর কেউ অবশিষ্ট থাকে না। এসব ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড আমাদেরকে ২০০২ সালের 'ক্লিনহার্ট অপারেশন'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন যৌথ বাহিনীর হেফাজতে মানুষজন অহরহই 'হৃদরোগে' মারা যেত। সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দেয় ২০০৩ সালে পাস হওয়া দায়মুক্তি অধ্যাদেশের কথা, যার মাধ্যমে আমাদের হত্যার বিচার চাওয়ার অধিকার হরণ করা হয়েছিল। তাই আমরা চলমান হত্যাকাণ্ডের মাত্রা ও এর ভবিষ্যৎ আইনগত পরিণতি নিয়ে শঙ্কা বোধ করছি।

প্রিয় কলমযোদ্ধারা

আপনাদের মাধ্যমেই আমরা জেনেছি যে, র‌্যাবের হাতে 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' মৃত্যুর ঘটনায় কেউ কেউ স্বস্তি প্রকাশ করছেন। কিন্তু পপুলার জাস্টিসের যে ধারণা সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, তাতে সন্ত্রাস কোনোভাবেই দূর হবে না, বরং আমাদের জন্য ডেকে আনবে মহাবিপর্যয়। আমরা কি স্মরণে রাখছি যে, র‌্যাবের হাতে কেবল 'শীর্ষ সন্ত্রাসী'রাই নিহত হয়নি, আরও নিহত হয়েছে মোহাম্মদ আলী ও সুমন মজুমদারের মতো হতভাগ্য মানুষেরা। একজন পুলিশকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা দলিল লেখক মোহাম্মদ আলীকে অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে তার ঘরে কিছু সময়ের জন্য লুকিয়েছিল। শুধু এই 'অপরাধে' ষাটোর্ধ্ব এই বৃদ্ধকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে এনে বুকে পা ঠেকিয়ে প্রকাশ্যে ১২ রাউন্ড গুলি করে তার দেহ ঝাঁঝরা করে দেয় পুলিশ। অপরদিকে সুমন ছিল আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। র‌্যাব সুমনকে ১৫ জুলাই বিকেল পৌনে চারটার দিকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় তারা কোনো ওয়ারেন্ট দেখায়নি। সেদিন দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সুমন পুলিশের হেফাজতে মারা যায়। সুস্থ-সবল দেহের যে তরুণটিকে র‌্যাব ধরে নিয়ে গেল তার শরীরে এতো আঘাতের চিহ্ন কোথা থেকে এলো, কীভাবে সে মৃত্যুবরণ করলো– তা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না। কিন্তু দৃশ্যত যেমনটা মনে হতে পারে, প্রকৃত ঘটনা তার চেয়েও

মারাত্মক। থানার নথিতে সুমনকে যে মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, সেটি দায়ের করাই হয়েছে তাকে গ্রেফতারের প্রায় সাত ঘণ্টা পর ১৫ জুলাই রাত এগারোটায়। সুমনের মৃত্যুর পর র‌্যাব দাবি করে, সুমন চাঁদাবাজির দায়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছে। কিন্তু যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে বলে বলা হয়েছে, তার আশপাশের লোকজন এমন চাঁদাবাজি বা গণপিটুনির কথা অস্বীকার করেছে। সুমনের পরিবার এ ঘটনার জন্য স্পষ্টভাবেই আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের একজন আসামির ভাইকে দায়ী করেছেন। র‌্যাবের বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র অভিযোগের ঘটনা নয়। পিচ্চি হান্নানের মেয়ে আইরিন সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছে যে, একজন এমপির নির্দেশে তার বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে খুলনায় র‌্যাবের হেফাজতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণকারী ওয়ার্ড কমিশনার লিটুর স্ত্রী ও ছোট ভাই একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যেসব গডফাদার লিটুকে ব্যবহার করেছিল তাদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা। কিন্তু পুলিশ সাংবাদিক সম্মেলনের দিনে সারা দিন তাদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখে এবং কাউকেই বাড়ির বাইরে যেতে দেয়নি। অর্থাৎ র‌্যাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া এবং একই সাথে গডফাদারদের স্বার্থরক্ষার অভিযোগ উঠেছে।

আমরা যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি তাদের মূল উদ্বেগ হচ্ছে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু। এই ধরনের মৃত্যু অনেক সময়ই ঘটে, আমরা বিভিন্ন আইনগত উপায়ে যার প্রতিবিধানের চেষ্টা করি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ক্রমশ প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বা যাচ্ছে। পুলিশের হাতে ক্রমাগত মৃত্যুর ঘটনায় আমরা এখন এক বিপর্যয়কালে আছি। উল্লেখ্য, পুরো ২০০৩ সালে পুলিশি নির্যাতনে মৃত্যু ঘটেছে মোট ৩৩ জনের। এ বছর প্রথম ছয় মাসে মারা গেছে ২৩ জন। অপরদিকে জুনের শেষভাগ থেকে প্রকৃত অপারেশনে যাওয়া র‌্যাবের হাতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মারা গেছে মোট ৩০ জন। সাধারণ পুলিশের বিশাল সংখ্যার বিপরীতে মাত্র সাড়ে চার হাজার সদস্যের র‌্যাবের হাতে মৃত্যুর এই সংখ্যা রীতিমতো আতঙ্কজনক। এর আগে ২০০২-এর ১৭ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২০০৩-এর ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন মাসেরও কম সময় ধরে চলা ক্লিনহার্ট অপারেশনে সেনা হেফাজতে মারা গিয়েছিল মোট ৫৬ জন। তারপরও কিছুদিন পরপরই বিচিত্র নামের নতুন নতুন স্পেশাল ফোর্স গঠনের খবর পাওয়া যায়। স্পেশাল ফোর্স গঠন এবং তাদের হাতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোকে আমরা যে যেভাবেই দেখি না কেন, এর পরিণতি হতে যাচ্ছে ভয়াবহ। যেভাবে ও যে হারে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হচ্ছে, তাতে আশঙ্কার যৌক্তিক কারণ রয়েছে যে, অচিরেই কেউ আর ঝুঁকিহীন থাকবে না। তাই প্রতিবাদ, প্রতিরোধের এখনই সময়।

প্রিয় সংবাদকর্মীগণ

আমরা মনে করি অভিযুক্ত যেই হোক না কেন, তার ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আছে; আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যতোই 'এলিট' হোক না কেন, তারা কোনোভাবেই সংবিধান বা আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং তাদের কাজ হচ্ছে আইনের বিধিনিষেধের মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করা। আমরা বিচার বিভাগের দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে দিতে পারি না। পুলিশ হেফাজতে 'সন্ত্রাসী'র মৃত্যুর এই রাষ্ট্রীয় অনুমোদন সাময়িক বিচারে কোনো কোনো মহলকে হয়তো স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তা বিচার ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থাহীনতাকে আরও প্রকট করে তুলবে এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরিণতিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারাই নির্বিচারে ঘটবে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তাই প্রশাসনের প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট দাবি হচ্ছে–

- পুলিশ হেফাজতে ঘটে যাওয়া সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক দোষীদের বিচারের ব্যবস্থা করুন।
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন।
- সংবিধান, আইন এবং আটক, গ্রেফতার, রিমান্ড ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ আদালতের দেয়া নির্দেশনা মেনে চলতে সকল বাহিনীর ওপর স্পষ্ট নির্দেশ জারি করুন।
- সকল বাহিনীর জবাবদিহিতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করুন।
- কথা বা কাজের মাধ্যমে এমন কিছু করবেন না, যাতে কোনো বাহিনী নিজেদের দায়মুক্ত ও আইনের ঊর্ধ্বে বলে ভাবতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাটা একদিনে তৈরি হয়নি, সমাধানটাও একদিনে আসবে না। মাঝখানে কোনো পাঁচমিশালী বাহিনী নামিয়ে কিছুদিনের জন্য হয়তো গুটিকয় 'শীর্ষ সন্ত্রাসী'কে ব্যতিব্যস্ত রাখা যাবে, সাময়িকভাবে তাতে কেউ কেউ কিছুটা স্বস্তিও বোধ করতে পারে; কিন্তু সমস্যাটি তার মূলসহ জায়গাতেই থেকে যাবে, পেছনে রেখে যাবে রাষ্ট্রের হাতে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিপজ্জনক নজির। আমরা প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় খরচ বাড়াতে বলেছি, সরকার শোনেনি; পুলিশ বাহিনীতে সংস্কার করার অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পড়ে রয়েছে, সরকার বাস্তবায়ন করেনি; আমরা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার কথা বলেছি, সরকার গুরুত্ব দেয়নি; দুর্নীতি কমানোর জন্য ন্যায়পাল আর স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ ঝুলে রয়েছে বছরের পর বছর, সরকার আমলে নেয়নি। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতিকল্পে আমাদের দাবি আর প্রাপ্তির এতো অসঙ্গতির পরও একটা বিশেষ 'কুলীন' বাহিনীর বদৌলতে হঠাৎ করে পরিস্থিতি সহনশীল হয়ে উঠবে– এটা নিতান্তই আকাশ-কুসুম কল্পনা। সন্ত্রাসের যাঁতাকলে ইতোমধ্যেই নিষ্পেষিত জাতি আজ অন্তত 'কুলীন' পুলিশের সন্ত্রাস থেকে রেহাই পেতে চায়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

সাংবাদিক
যারা মারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে দু'জনের কথা আপনারা বললেন, পিচ্চি হান্নান এবং লিটু। এই দু'জনের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমরা সাংবাদিকরা ইতোপূর্বে অনেক লিখেছি। পিচ্চি হান্নান ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, তার মাসিক আয় কত সেটাও আমরা লিখেছি। তার সোর্স অফ ইনকাম কী ছিল এবং এজন্য কত মানুষ-ব্যবসায়ী নির্যাতিত হয়েছে তাদের হাতে, সেসবও পত্রিকায় এসেছে। তখন এ ব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কী ছিল?

সুলতানা কামাল
আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করছি সেটা আমরা শিরোনামে বলেছি যে, "অবিলম্বে বন্ধ করুন স্পেশাল ফোর্সের এই হত্যাযজ্ঞ।" সাধারণভাবে যখন একটা ক্রাইম হয়, সেটার জন্য মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কতগুলো দায়িত্ব থাকে। আমাদের যে দায়িত্ব থাকে সেটা হলো যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বা সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। যখন কোনো একজন মানুষ অপরাধ করবে কিংবা সন্ত্রাসে লিপ্ত থাকবে সেখানে দেশে যে প্রচলিত ব্যবস্থা রয়েছে সেটার মাধ্যমেই তার বিচার হবে। যখনই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরা অত্যাচার করছে, আমরা অনবরত সরকারের সাথে আলোচনায় যাচ্ছি, তাদেরকে চিঠি লিখছি। অন্যায়ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এমন নালিশ আমাদের কাছে আসলে আমরা তখন আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি বিভিন্নভাবে। কখনো আইন ও সালিশ কেন্দ্র নিয়েছে, কখনো ব্লাস্ট নিয়েছে, কখনো অন্য সংগঠন নিয়েছে। আমরা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছি, আমরা আইজির কাছে চিঠি দিয়েছি, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী প্রধান যিনি আছেন তার কাছেও চিঠি দিয়েছি। এ ধরনের পদক্ষেপ আমরা নিয়মিতই গ্রহণ করে থাকি।
আমরা আপনাদের সাথে অনেকটাই একমত, কারণ আপনাদের কাছ থেকেই এ তথ্যগুলো পাই। যেমন, র‍্যাবের হাতে যতজন মারা গেছে এবং এর আগেও ক্লিনহার্ট অপারেশনে যারা মারা গেছে তাদের অনেকেই সন্ত্রাসী ছিল, অনেকেরই রেকর্ড খুব খারাপ ছিল। কিন্তু আমাদের যে মূল বক্তব্য, আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে– বিচার বিভাগের যে দায়িত্ব সেটা আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি না। আমরা চাইছি অবশ্যই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হোক, অবশ্যই চাইছি মানুষ নিরাপত্তার মধ্যে বাস করুক, স্বস্তির মধ্যে বাস করুক; কিন্তু এভাবে তো কখনোই সমাধান পাওয়া সম্ভব না। আগেও বিভিন্ন বাহিনী অপারেশনে নেমেছে কিন্তু তারপরেও কি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি আমরা দেখতে পেয়েছি কোথাও? এভাবে অপরাধ তো কমানো যাবেই না, বরঞ্চ উল্টো ফল হবে। আমরা চাই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হোক, আমরা স্বস্তি চাই, আমরা নিরাপত্তা চাই, আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে মৃতদেহের ছবি দেখতে চাই না, আমরা রক্তক্ষরণ দেখতে চাই না। সেটা বন্ধ করার জন্যই তো এই ফোর্সগুলি নামানো হয়েছে। নেমে যদি তারাই আবার সে জিনিসগুলি উপহার দেয় তখন আমরা কী করবো?

সাংবাদিক
আসলে আমাদের প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে ১৪ কোটি মানুষ। এই ১৪ কোটি মানুষ যদি ৮০ জন লোকের কাছে জিম্মি হয়ে যায়, তাহলে কি এর জন্য সরকারের কিছু করার নেই? এটা আপনাদের কাছে প্রশ্ন। আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, আপনি একজন বাংলাদেশের নাগরিক, আমিও একজন বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা চাই বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে। আমরা প্রায়ই পত্রিকায় লিখি বা দেখি একটা সন্ত্রাসীকে ধরে কোর্টে দেয়ার পরে সে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং পরে আগের মতোই কাজ করে। কিছুদিন আগে আমরা একটা পত্রিকায় দেখলাম যে, মজুদদারদের বিরুদ্ধে র‍্যাব নামবে। এই যে র‍্যাব নামবে নিউজটা হওয়ার পরে আমি বাজারে গিয়ে দেখেছি যে, মজুদদাররা রীতিমতো ভীতির মধ্যে আছে– র‍্যাব-ভীতি। আমার কথা হচ্ছে যে, র‍্যাব বা অন্য যেকোনো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি জনগণের জন্য ভালো কিছু করতে পারে তাহলে কি আপনারা সাপোর্ট দেবেন না?

সুলতানা কামাল
নিশ্চয়ই দেবো। কিন্তু এটা আপনার প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে যে, জনগণের ভালো করতে হবে। আমরা কিন্তু একবারও এখানে র‍্যাব নামানোর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। র‍্যাব নামতে পারে, যেকোনো ফোর্সই নামতে পারে। সরকারের যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটা সে পালন করবে। আমরা যেটা বারবারই বলছি, তা হলো সরকারকে সেটা সংবিধানের মধ্যে থেকেই করতে হবে এবং যেকোনো বাহিনী কাজ করতে যেয়ে আইনের মধ্যে থেকেই তা করবে। এটাই আমাদের বক্তব্য, আর কিছুই নয়।

ফরিদা ইয়াসমিন
আপনি আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে– আমরা মানবাধিকার সংগঠনগুলো কী করছি? এই যে বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের হাতে বিভিন্ন জন নির্যাতিত হচ্ছে, আমরা তাদেরকে কিন্তু আইন সহায়তা দিচ্ছি। সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় তাদেরকে আমরা আইন সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি। নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষমতা আমাদের মতো মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নেই, সেটা কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তবে কারোরই কিন্তু আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার নেই। আজকে হয়তো এরা আইন হাতে তুলে নিচ্ছে, পরবর্তীতে অন্যেরা একই কাজ করবে, সেটার ফাঁকে ফাঁকে কিছু নিরীহ মানুষও এর শিকার হবে।

সাংবাদিক
মূলত আপনাদের প্রধান আবেদন হচ্ছে, এ হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে হবে এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে তথ্য পেয়েই আপনারা এই সংবাদ সম্মেলন করছেন। র‍্যাব বা চিতা বা অন্য যে বাহিনীই হোক তারা অপরাধীদের ধরছে এবং তাদের হেফাজতে অপরাধীরা মারা যাচ্ছে। যদিও তারা ব্যাখা দিচ্ছে যে, এরা 'ক্রসফায়ারে' মারা যাচ্ছে বা অন্য কোনো কারণে মারা যাচ্ছে। আপনারা কি আপনাদের মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে মাঠে গিয়ে কখনো দেখেছেন যে, তাদের এই ব্যাখ্যাটি মিথ্যা অথবা আসলেই তারা 'ক্রসফায়ারে' মারা যাচ্ছে না অথবা তাদেরকে ইচ্ছে করেই মারা হচ্ছে? কখনো দেখেছেন কিনা? নাকি আমাদের এই পত্র-পত্রিকার আলোকেই আপনারা সব তথ্য পান?

সুলতানা কামাল
না, আপনাদের পত্র-পত্রিকার আলোকেই আমরা সব তথ্য পাইনি। মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে যখনই আমরা কোনো তথ্য পাই তখন আমাদের একটা সাধারণ নিয়মই আছে যে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষ থেকেও একটা ইনভেস্টিগেশন করি এবং প্রচুর ক্ষেত্রে আমাদের কাছে তথ্য আছে যে, সেখানে 'ক্রসফায়ার' বলে কোনো কিছু হয়নি।

সাংবাদিক
সেই তথ্যগুলি আমাদের কি দেয়া যায়– কতজনকে ইচ্ছাকৃত মারা হয়েছে?

সুলতানা কামাল
আমরা ইতোমধ্যে কয়েকজনের কথা বললাম। সুমন মজুমদার একজন আছে, মোহাম্মদ আলীর ব্যাপার আছে। এদের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই ইনভেস্টিগেশন করেছি। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন রয়েছে।

ফরিদা ইয়াসমিন
একটি বিষয় যদি আপনারা খেয়াল করেন যে, প্রথম দিকের ঘটনায় কিন্তু ওরা বলেনি যে ক্রসফায়ারে মারা গেছে। যখন মৃত্যুগুলো নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল– আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা এবং আমরা প্রশ্ন তুললাম, তখনই কিন্তু তারা বলছে ক্রসফায়ারে মারা গিয়েছে। আপনারা তদন্তের ব্যাপারে যেটা জিজ্ঞেস করেছেন তার উত্তরে বলছি– আমরা ব্লাস্ট এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র চেষ্টা করি আমাদের নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন সেলের মাধ্যমে তদন্ত করার এবং সুমনের ওপর করা তদন্ত রিপোর্টটি পত্রিকাতেও এসেছে। অধিকার, ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র যে তদন্ত করে, তার রিপোর্টও পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

সাংবাদিক
আপনারা বলেছেন যে, ৩২ জন এ পর্যন্ত র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে মারা গেছে। আপনারা আরও বলেছেন যে, আপনারা নিজেরা গিয়েও দেখেছেন– ঘটনাটি কী। সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারে মামলা করার কোনো প্রস্তুতি আপনাদের আছে কিনা? আরেকটি বিষয় আপনারা বলেছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে র‍্যাবের আইনকে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। সে বিষয়ে আইনের আশ্রয় নেয়া বা পরবর্তীতে কোনো আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তা আপনাদের আছে কিনা?

সুলতানা কামাল
আমরা বলেছি যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার সুযোগ আইনে রয়েছে। আর মামলার ক্ষেত্রে বলি, আমাদের যখন মামলা করতে হয়, তখন সেজন্য আমাদের সুস্পষ্ট অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। আমরা এখনও সেরকম পর্যায়ে উপনীত হইনি যে, এখনই মামলা করা যায়। অর্থাৎ, আমরা এখন পর্যন্ত বলতে পারি না যে, মামলা করার প্রস্তুতি আমাদের আছে। এই প্রেস কনফারেন্সটা আমাদের প্রথম বড় কর্মসূচি। পরবর্তীতে যদি এ ধরনের ঘটনা চলতে থাকে এবং মামলা করার প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তাহলে আমরা মামলা করার কথা অবশ্যই চিন্তা করে দেখবো।

সাংবাদিক
এখানে আপনাদের বক্তব্যে সাংবিধানিক, মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলেছেন। অধিকারগুলো রক্ষার ব্যাপারে উচ্চ আদালতে গিয়ে কিছু করার চিন্তা আছে কিনা?

সুলতানা কামাল
আপনারা হয়তো অতীতে লক্ষ্য করে থাকবেন, বিডিআরকে যখন যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে নামানো হয়েছিল তখন আমরা মামলা করেছিলাম এবং বিডিআরের অপারেশন কিন্তু বন্ধ করা হয়েছিল। ৫৪ ধারার অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও আমরা মামলা করেছি এবং কোর্ট থেকে সে ব্যাপারে আমরা কিছু নির্দেশনা পেয়েছি যে, এরকম অপব্যবহার করা চলবে না। তারপর গণগ্রেফতারের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে, ইনজাংশন পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল যে, গণগ্রেফতার করা চলবে না। আমরা আগেও বলেছি যে, একটা মামলা করতে গেলে কিন্তু অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে তাদের সম্মতি, তাদের প্রস্তুতি, তাদের সাক্ষ্য, তাদের নিরাপত্তাবোধ অনেক কিছু কিন্তু চলে আসে এখানটায়। কাজেই আমরা একটা সংগঠন হিসেবে হঠাৎ করেই কিন্তু মামলা করতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত যারা এই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা যথেষ্ট ধাতস্থ হয়ে বলতে পারে যে, হ্যাঁ আমার এখানে কথা বলার একটা দায়িত্ব আছে, নির্যাতনের কথা বলার প্রয়োজন আছে এবং আমি আদালতে গেলে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবো। যেমন অনেক ক্ষেত্রেই আপনারা দেখেছেন যে, যখন একটা মামলা করা হয়, সেখানে আমরা যদি নিশ্চিত না হতে পারি যে, মামলা চালানো যাবে, বাদির বা সাক্ষীর নিরাপত্তা দেয়া যাবে, তাহলে আমরা কিন্তু মামলা করি না। কাজেই এখানটায় অনেক কিছুর ওপরই নির্ভর করবে যে আমরা আদালতে যাবো কিনা।

সাংবাদিক
আপনার বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে, সরকার যখনই কোনো ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করছে তখনই আপনারা তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। আইন করছেন, মামলা করছেন। এখন র‍্যাবের যে একশন এটাকে শতকরা ৮৯ ভাগ লোক সাধুবাদ জানাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যৌথ অভিযান, ৫৪ ধারার ক্ষেত্রে আপনাদের আইনগত উদ্যোগ গ্রহণের পর সরকার যখন এই পদক্ষেপগুলো বন্ধ করলো তারপরেও কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। আপনারা সরকারকে কোনো সাজেশনও দেননি যে, এই পথে গেলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে। এখন সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য সরকার র‍্যাব নামিয়েছে। এটাকে বন্ধ করার জন্য আপনারা উঠে-পড়ে লেগেছেন কেন? আপনারা সন্ত্রাসীদের পক্ষ নিয়ে আজকে সংবাদ সম্মেলন করছেন, প্রেসকে ডেকেছেন। সন্ত্রাসীরা যখন মায়ের কোল শূন্য করে তখন আপনাদের কেন দেখা যায় না? তখন আপনারা চুপ থাকেন কেন?

আব্দুস সালাম
সন্ত্রাস দমনের নামে আমরা কেউই আইনকে অবমাননা করতে পারি না– এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্থিতির পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে, মানবাধিকার রক্ষা, নাগরিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে। সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের। মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে আমরা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রের কাছে সন্ত্রাস দমনের জন্য, সন্ত্রাসের উৎসগুলোকে বন্ধের জন্য প্রচারণা করে আসছি, আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি। তার মানে এই নয় যে, ভালো কাজ বন্ধ করার লক্ষ্যে আমরা আজকে র‍্যাবের বিপক্ষ নিচ্ছি। কেউই বিচারের ঊর্ধ্বে নয়।

সাংবাদিক
তাহলে র‍্যাবের অভিযানের পর যে সন্ত্রাস কমছে, আপনি কি তা অস্বীকার করছেন?

আব্দুস সালাম
সন্ত্রাস আপাত কমছে ঠিকই কিন্তু এভাবে মেরে তো প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়।

ফরিদা ইয়াসমিন
এর আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কিছু করেছি কিনা। সাংবাদিক বন্ধুদের একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, বাংলাভাই যখন সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়েছিল তখন রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বসেই কিন্তু আমরা তার বিরুদ্ধে প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম, আপনাদের হয়তো বা স্মরণে আছে। তাই এটা কিন্তু ঠিক না যে, আমরা সন্ত্রাসীদের কাজকে উৎসাহিত করে যাচ্ছি।

সুলতানা কামাল
আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এনেছেন যে, সরকার যখন একটি ভালো কাজ করছে তখনই আমরা বাধা দিচ্ছি এবং আমরা সন্ত্রাসীদেরকে সমর্থন যোগাচ্ছি। আমাদের লিখিত বক্তব্যের মধ্যে যে প্রশ্নটা ছিল সে প্রশ্নটাই আমরা আপনাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি যে, তাহলে কি আমরা পুলিশ দিয়েই কিংবা এ ধরনের বিশেষ বাহিনী দিয়েই সন্ত্রাসীদের বিচার করবো, আদালত উঠিয়েই দেব?

সাংবাদিক
তাহলে আপনাদের সাজেশন কী?

সুলতানা কামাল
আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সরকার আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা করে আমাদের যখনই ডাকে, আমরা তখন সেখানে যাই এবং আমাদের পরামর্শ তাদেরকে দেই। আপনারা বলছেন যে, আমরা কিছুই করি না– এটি সম্পূর্ণ ভুল। আপনি হয়তো জানেন না বা ফলো করেন না, আমরা কী কাজ করি। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি আমরা অন্য কী কী কাজ করি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সরকারকে পরামর্শ দেই যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হলে কী কী কাজ করা যেতে পারে। এখানেও কিছু সাজেশন আমরা রেখেছি। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে আমরা তাদেরকে সেটা বলছি। সন্ত্রাসীদের লালন করা কোনো মানবাধিকার সংগঠনের কাজ হতে পারে না। আমরা যে কাজটা করি সেটা সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিয়েই করি। কাজেই আপনারা যদি হঠাৎ বলে বসেন যে, আমরা সন্ত্রাসীদের লালন করি এবং ভালো কাজে বাধা দেই, তবে সেটা আমাদের প্রতি সুবিচার হয় না। আমার মনে হয়, আপনারা আবার আপনাদের বিশ্লেষণগুলো দেখবেন– আপনারা ঠিক বিশ্লেষণ করতে পারছেন কিনা। আপনারা আইন ও সালিশ কেন্দ্রে আসতে পারেন, আমাদের সাথে কথাও বলতে পারেন, অন্য সকল সংগঠনে গিয়ে দেখতে পারেন যে, আমরা কী ধরনের কাজ করি। আজকে স্বল্প পরিসরে এর ব্যাখা দেয়া সম্ভব নয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। ব্লাস্ট, নারীপক্ষ প্রত্যেকের ইতিহাসই অনেক দীর্ঘ। কিন্তু আজকে আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে যে, আপনারা কি আদালতের বাইরে পুলিশ নিয়ে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সন্ত্রাস নির্মূল করতে চান? সেটাই আপনারা সমর্থন করতে চান? আপনারা করতে পারেন, সেটা আপনাদের মতামত হতে পারে। যদি ১৪ কোটি মানুষের ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ মানুষও সেটা বলে, তবুও মানবাধিকার কর্মী হিসেবে, মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে আমরা বলেই যাবো যে, এটা অন্যায়, এটা সংবিধানবিরোধী।

সাংবাদিক
আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শীর্ষ সন্ত্রাসী ধরা, মজুতদার ধরা কিংবা চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা বন্ধেও র‍্যাব নামানোর কথা বলা হচ্ছে। এখন বেসিক জায়গা হচ্ছে, কোন পরিস্থিতিতে র‍্যাবের উদ্ভব? পুলিশ বাহিনী তাহলে কী করবে? যদি র‍্যাব মজুদদারও ধরে আবার চলচ্চিত্রে অশ্লীলতাও বন্ধ করে, পাড়ার মাস্তানও ধরে, শীর্ষ সন্ত্রাসীও ধরে তাহলে পুলিশের ভূমিকা কী? এ বেসিক জায়গাটাতে আপনারা প্রশ্ন তুলছেন কিনা?

সুলতানা কামাল
আমরা প্রশ্ন তুলেছি। আমাদের লিখিত বক্তব্যের মধ্যে প্রথমেই কিন্তু আছে যে, দুটি বিশেষ দায়িত্ব র‍্যাবকে দেয়া হয়েছে। র‍্যাব সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সশস্ত্র পুলিশের সাধারণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অপরাধ ও অপরাধমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা এবং সরকারের নির্দেশে কোনো অপরাধের তদন্ত পরিচালনা করা র‍্যাবের কাজ। কাজেই যে উদাহরণগুলি আপনি উঠালেন সেখানে কিন্তু র‍্যাবের কোনোরকম এখতিয়ার আছে বলে আমরা দেখছি না। কাজেই যে কাজগুলোই তারা তাদের এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে করছে, আমরা সেগুলি নিয়েও প্রশ্ন তুলছি।

রেজানুর রহমান
রাষ্ট্র নিজেই যদি সন্ত্রাস জন্ম দেয় তাহলে রাষ্ট্রের নিজেরই সন্ত্রাসী কায়দাতে সেই সন্ত্রাসীকে দমন করতে হবে। কারণ সন্ত্রাস যদি সন্ত্রাসের ভেতর থেকেই জন্ম নেয়, সেটা আইন দিয়ে কখনো দমন করা যায় না। সে কারণে র‍্যাব বা র‍্যাবের মতো অন্য উদ্যোগগুলো নেয়া হয়েছে। আমি সেগুলোর একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে দিতে চাই। খুলনায় যখন স্পাইডার ওয়েভ অপারেশন চালানো হলো তখন একজন সাংবাদিক একটি ছোট্ট নিউজ করেছিলেন ওখানকার স্থানীয় পত্রিকায় যে, ওখানকার একটি ক্যাম্পে প্রতিদিন দু'শটি করে পেয়ারা দিতে হয় আর্মিদের খাবারের জন্য এবং কয়েকটি মুরগি ও ছাগল দিতে হয়। এই সংবাদটির জন্য স্পাইডার ওয়েভের সংশিষ্ট ক্যাপ্টেন তার এখতিয়ারের বাইরে অন্য একটি এলাকা থেকে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে এরেস্ট করে নিয়ে এসে তাকে যে পরিমাণ নির্যাতন করেছে এবং আজকে তার যে শারীরিক অবস্থা– সেটি প্রশ্নবোধক। কারণ তাকে এরেস্ট করার এখতিয়ার ওই ক্যাপ্টেনের নেই। তার এলাকায়ও সে বসবাস করে না, আর জনগণেরও দু'শ করে পেয়ারা আর্মিদেরকে খাওয়ানোর কথা না। আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় যদি পুলিশের বেতন হয় আর আর্মিদের বেতন হয়, তাহলে পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। র‍্যাবের জন্ম দেয়ার দরকার নেই।

সুলতানা কামাল
আমরা আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন এখানেই শেষ করছি। আমি সাংবাদিক ভাইদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তারা সময় করে এসেছেন এবং আমাদেরকে সাংবাদিক সম্মেলনটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন।▫